**Pratidhwani the Echo**
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.133-145*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# স্বরচিত উপন্যাসের নাট্যরূপায়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: উৎস, প্রেক্ষিত ও মঞ্চ প্রতিক্রিয়া

**জিসান হাবিব**
*পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract:***

*Rabindranath Tagore converted five of his novels into play. He recreated them basically to perform on stage and as he was also not satisfied with the plot and sometimes due to the demand of the character. Why did he write both novel and play with the same content? And how much this conversion was appreciated by audience? What thoughts came to his mind while producing his own play. I have discussed to what extent the individual philosophy of Rabindranath Tagore has been influenced by those above mentioned thoughts.*

*Keywords : The practice of play in Thakurbari and Rabindranath Tagore, writing play and beginning of acting, Conversion of his novels into play, their stage performance and development of his own thoughts.*

ঠিক কেমন সাংস্কৃতিক জলহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেড়ে উঠছেন? এর আভাস আমরা পাই ১৯৪০ সালে কবির লেখা 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে। জীবনের শেষলগ্নে এসেও কবির মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে বাড়ির নাট্য অভিনয়ের কথা। তিনি লিখছেন-

> *".. নাটক অভিনয়ের একটা ফূর্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু কী আর বলব, আমরা সে সময় ছিলাম ছেলেমানুষ। তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত যাও খেলা করগে..... এ বাড়ির বারন্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়। দেউড়ির সামনে দেখতুম বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।..... নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো আসে তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম যিনি কাঁদছেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভগ্নীপতি।"* [১]

আবার 'জীবনস্মৃতি' বইটিতে আছে এই ধরনের বর্ননা, ভৃত্যরাজকতন্ত্রে থাকা ছয় বছর বয়সি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-

> *"মনে পড়ে খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া একএকদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বলিতেছে লোক চলিতেছে, দ্বারে কত বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কি হইতেছে ভালো বুঝিতাম না কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝখানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না, তবু সে আমার শিশুজগত হইতে বহুদূরের আলো। আমার খুড়তুতো ভাই গনেন্দ্রনাথ তখন রামনারায়ন তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন।"* [২]

শিশু রবীন্দ্রনাথ সেই 'আমোদে' অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। কিন্তু অনাদরকে এক মস্ত স্বাধীনতা মনে করে তিনি নিজের কল্পনার ডাল মেলতেন। আমরা তাঁর প্রত্যক্ষ নাটকে অংশগ্রহণ তথা অভিনয়ের প্রমাণ পাই হরিশ্চন্দ্র হালদারের লেখা 'মুক্তকুন্তলা' নাটকে। বাল্যকালের এই অভিনয়ের বর্ননা তিনি দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়। তিনি লিখছেন কুস্তির

আখড়ায় একবার তিনি গোটাকতক 'বাঁখারি পুঁতিয়া তাহার উপর কাগজ মারিয়া নানা রঙের চিত্র আঁকিয়া, একটা স্টেজ খাড়া করিয়া ছিলাম।' 'গল্পসল্প'র সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় কবি এই নাটকের নায়িকা মুক্তকুন্তলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যদিও পরে তিনি খেলাচ্ছলের এই অভিনয়কে বাদ দিতে চেয়েছেন। তিনি লিখছেন ' নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়'। যদিও এই প্রথম অভিনয়ের তথ্য নিয়ে বিভিন্ন মত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চার বছর তখন ঠাকুরবাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও কয়েকজনের উদ্যোগে তৈরি হল জোড়াসাঁকো থিয়েটার। এই থিয়েটার নির্মানের প্রেরণা তারা পেয়েছিলেন সেইসময়ের বিখ্যাত পালাকার গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে। ১৮৬৭ সালের ১৪ জুলাই গুনেন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখছেন-

> *"*My dear Goonoodada – It is but a few days ago than I received a letter from yourself and one from Jodoo…..the orijin of the Jorasanko Theatre is now hidden in the deep folds of rusty antiquity!! It was Gopal Ooriah'sJatra, that suggested us the idea of projecting a theatre.*"*[৩]

কমিটি অফ ফাইভএর (গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণবিহারী সেন, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়) তত্ত্বাবধানে এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ' কৃষ্ণকুমারী নাটক' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকের। নাটককে আরও সমাজ সংস্কারের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাঁরা স্থির করলেন শিক্ষিত মানুষজনদের এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত করার। আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানতে পারি এই নাট্যশালা ১৮৬৫ সালের জুন মাসে 'ইন্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় বহুবিবাহ বিষয়ে একটি নাটক চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পকয়েক দিন পরে তাঁরা সেই বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নিয়ে পণ্ডিত রামনারায়ন তর্করত্নকে দায়িত্ব দেন একটি নাটক রচনা করবার জন্য, যারই ফলে তিনি লেখেন 'নব নাটক'। কমিটি হিন্দু মহিলাদের দুরাবস্থা ও পল্লীগ্রামস্থ জমিদারগনের অত্যাচার এই দুই বিষয়ে নাটক চেয়ে ১৫ জুলাই ১৮৬৫ তারিখে 'ইন্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়।

জোড়াসাঁকো থিয়েটারের এই নাটক নির্বাচনের বিচিত্র ভঙ্গি দেখে একথা আমরা বলতে পারি তাঁরা খুব সহজেই সমাজ পরিবর্তনের ধারাটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। না হলে যেখানে সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে ইংরাজি শিক্ষিত শহুরে নব্যবাবুর দল দেশীয় কনভেনশনকে ছুঁড়ে ফেলছেন, 'দেশের ঠাকুরকে মাটিতে ফেলে বিদেশের কুকুর' কে মাথায় নিয়ে ঘুরছেন সেখানে ঠাকুর পরিবারের অন্য জল হাওয়া নতুন থিয়েটার খুলছেন যাত্রা দেখে। বিষয় হিসাবে চাইছেন সমকালীন সমস্যাকে, এমন কি নাটককার হিসাবে চাইছেন অপরিচিত কাউকে। শুধু 'নির্দোষ আমোদ' দেওয়া নয় থিয়েটারে যে 'নোকশিক্ষে' হয় তারও সূচনা করতে চাইছেন।

আমরা আগেই বলেছি ঠাকুর বাড়ির নাট্যচর্চাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ছোটবেলায় কবির উপরে এই জ্যোতিদাদার প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। হিন্দুমেলা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ার দেখা যায়, সেই হাওয়া মোরগ প্রভাবিত করেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। ১৮৬৮ সালের হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি পাঠ করেছিলেন 'উদ্বোধন' নামে একটি কবিতা। এই যে জাতীয়তাবাদের টাটকা ঝড় উঠেছিল সেই ঝড় প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদাকে। তিনি লিখলেন ঐতিহাসিক 'পুরুবিক্রম' নাটক। সেটা দিয়েই তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। এছাড়াও লেখেন আরও দুটি ঐতিহাসিক নাটক, বলাবাহুল্য তাঁর এই নাটকগুলিও সাহিত্যগুণ যতখানি ছিল তারচেয়েও বেশি ছিল দেশপ্রেমের আবেগ। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুসারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' প্রকাশিত হয় ৩০ নভেম্বর, ১৮৭৫ তারিখে। এই নাটকে কবি অভিনয় করছেন, এমনকি নাট্য সংলাপের রদবদল করছেন। যেমন সরোজিনী নাটকে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ একটি অংশ গদ্যসংলাপের পরিবর্তে নাট্যিক যুক্তিতে ' জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি যুক্ত করেন। অভিনয়ের দিক দিয়ে এই নাটকটি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। সরোজিনীর ভূমিকায় অভিনয়কারী বিনোদিনী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন – ' সরোজিনী নাটকের একটি দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতা রোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চারজায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু'তিন হাত উঁচুতে উঠে লকলক করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, স্টেজের

ওপর ৪।৫ ফুট লম্বা সরু সরু কাঠ জ্বেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের শাড়ী পড়ে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই ---

*'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ*
*পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা...'*

*গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে আর ঝুপ করে আগুনের মধ্যে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে..... তখন যে কিরকম উত্তেজনা হ'ত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।'*[৪]

দৃশ্যটি কেমন উত্তেজনা তৈরি করত তা আমরা বিনোদিনীর কথা থেকে বুঝতে পারি। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ নাটকটি মঞ্চস্থ হবার আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন গদ্য সংলাপ অপেক্ষা গানের আবেদন কতখানি বিস্তার লাভ করবে। ১৪ বছর বয়সের মধ্যে তিনি নাটকের গান রচনা করে দক্ষতার পরিচয় দিলেন আর তাতে করে

*'ইহার পর রবীন্দ্রনাথকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন'।*[৫]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন-

*"সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা কবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেনিতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চায় আমরা তিনজন- অক্ষয়, রবি ও আমি"।*[৬]

**২**

এখানে আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথের অভিনয় কিংবা নাটক দেখা মোটামুটিভাবে সীমিত ছিল ঠাকুরবাড়ির মধ্যে। অবশ্য জ্যোতিদাদার লেখা নাটকে গান যুক্ত করেছেন কিংবা পেশাদার মঞ্চে অভিনয় দেখছেন 'অশ্রুমতী' নাটকের। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' তে আমরা তেমনই সাক্ষ্য পাই। এরপরের অংশে আমরা আলোচনা করব তাঁর রূপান্তরিত নাটকগুলির উৎস ও প্রেক্ষিত। তিনি যে উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল-

| **উপন্যাস** | **রূপান্তরিত নাট্যরূপ** |
|---|---|
| রাজর্ষি ( ১২৯৩ ) | বিসর্জন ( ১২৯৭ ) |
| বউ ঠাকুরাণীর হাট ( ১২৮৯ ) | প্রায়শ্চিত্ত ( ১৩১৬ ) |
| প্রজাপতি নির্বন্ধ (১৩১৪) | চিরকুমার সভা ( ১৩৩২ ) |
| মালঞ্চ ( ১৩৪০ ) | মালঞ্চ ( ১৩৭৫ ) |
| যোগাযোগ ( ১৩৩৬ ) | যোগাযোগ ( ১৪০২) |

**রাজর্ষি ( ১৮৮৭) : বিসর্জন (১৮৯০)**

১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনার পিছনে এক অদ্ভুত কাহিনি আছে, কবি নিজেই জানিয়েছেন রচনার সেই ইতিহাস। জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখছেন ' দুই এক সংখ্যা 'বালক' বাহির হইবার পর দুই একদিনের জন্য দেওঘরে যাই। কলিকাতা ফিরিবার সময় রাত্রে গাড়িতে ভিড় ছিল, ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না। ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্ত চিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ---

*"বাবা, এ কি ! এ যে রক্ত!' বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথছ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনমতে তাহার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।- জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ্যমাণিক্যের ইতিহাস মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে 'বালক'এ বাহির করিতে লাগিলাম।"*[৭]

'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনির প্রথম থেকে আঠারো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্প নিয়ে 'বিসর্জন' নাটক লেখা হয়েছে। ৩২, ৩৩, ৩৬ ও ৩৭ পরিচ্ছদ থেকে নক্ষত্র রায়ের বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এসেছে নাটকে। উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্র বাদ দিয়েছেন তিনি। বিসর্জনের রচনাকালীন পটভূমি বিষয়ে একটি ছবি পাওয়া যায় এর উৎসর্গ অংশে। সেখানে কবি, 'শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু' উদ্দেশ্য করে লিখেছেন একটি দীর্ঘ কবিতা।

''তোরি হাতে বাঁধা খাতা / তারি শ-খানেক পাতা/ অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে/ মস্তিষ্ককোটরবাসী / চিন্তাকীট রাশি রাশি/ পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে...''। এই খাতা এবং তাঁর লেখা নিয়ে কবি যে রহস্য রেখেছেন তার উন্মোচন করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ঘরোয়া'তে তিনি লিখছেন

> ''.....রবিকাকা আছেন পরগণায়। দাদা, অরুদা আমরা কয়েকজনে একটা কী নাটক হয়ে গেছে আর একটা নাটক করব তার আয়োজন করছি। 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কথাগুলি নিয়ে খাড়া করে তুলেছি নাটক করব । ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে আমরা সব তাকিয়া বুকে নিয়ে এই সব ঠিক করছি --- এমন সময় রবিকাকা কী একটা কাজে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন দেখি কী হচ্ছে! খাতাটা নিয়ে নিলেন, দেখে বললেন, না, এ চলবে না --- আমি নিয়ে যাচ্ছি খাতাটা, শিলাইদহে বসে লিখে আনব, তোমরা এখন আর কিছু করো না। .....এর কিছু দিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন আট দশ দিন বাদে ফিরে এলেন, বিসর্জন নাটক তৈরি।'' [৮]

এখানে একটু তথ্যগত বিভ্রান্তি আছে, অবনীন্দ্রনাথের মুখে বলা এই স্মৃতি কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন রাণী চন্দ। পরে অবশ্য পুলিনবিহারী সেনের একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী রাণী চন্দ অবনীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থের নাম বলেছিলেন তা সঠিক করে বলতে পারেননি। ১৮৯০ সালে মূলত বাড়িতে অভিনয় হবে এমন উদ্দেশ্যেই এই নাটক লেখা হয়।

'বিসর্জন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে( ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ), আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে। প্রথম প্রকাশের পরে ১৩০৩ সালে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে এই নাটক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়, কিন্তু এই প্রকাশে প্রথম সংস্করণ থেকে অনেকটাই বদলে যায়। কার্যত একে দ্বিতীয় সংস্করন বলা যায়। এরপর আবার ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১ আষাঢ় আলাদা বই আকারে আরো কিছুটা পরিবর্তন করে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' নাম দিয়ে এই নাটকের পরবর্তী প্রকাশ হয়। কিন্তু আদতে এটি তৃতীয় সংস্করণ। অবাক করার মত বিষয় হল এরপরে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলি যেটি হিতবাদী প্রকাশ করেছিল ১৩১১ বঙ্গাব্দে, সেখানে এল ১৩০৬ এর সংস্করণ অনুসারে দৃশ্যবিভাগ। ১৩২৩ সালে বিসর্জনের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় কিন্তু সেটি আবার ১৩১০ এর পুনর্মুদ্রন। এরপরে কাব্যগ্রন্থাবলিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছিল তার অনেক পরিবর্তন করে তৃতীয় সংস্করণ নামে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় এই নাটক। এই সংস্করণের সম্পাদনা করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি এখানে ফিরিয়ে আনেন প্রথম সংস্করণের অনেক উপাদান এবং অবশ্যই বেশ কিছু নতুন অংশ। পাঠ পরিচয় অংশে তিনি এই সংস্করণ সম্পর্কে লিখছেন –

> '' গত ৩০ বৎসরের মধ্যে কোনো সংস্করণ না হওয়ায় বিসর্জনের পাঠ অনেক জায়গায় অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমান সংস্করণের পাঠ ১২৯৭ সালের প্রথম সংস্করণ, ১৩০৩ সালের সংগৃহীত সংস্করণ ও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের শোভন সংস্করণের সহিত মিলাইয়া প্রস্তুত করা হইল। বর্তমান সংস্করনে প্রথম সংস্করণের অনেকগুলি পরিত্যক্ত অংশ পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে, এবং ১৩৩০ সালে সম্পূর্ণ নূতন একটি অংশ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য বর্তমান সংস্করণে কবি অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ সম্পূর্ণ নতুন করিয়া সাজাইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণটিকে সত্য সত্যই একটি সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণ, এবং বর্তমান পাঠ (ছাপার ভুল বাদ দিয়া) মোটামুটি প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যেতে পারে।'' [৯]

তবুও এটাই প্রচলিত সংস্করণ নয়, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো ৫ বছর, ১৩৩৮ এ প্রকাশিত 'চতুর্থ সংস্করণ'টিই প্রচলিত পাঠ। যা আবার ১৩১০ এর সংস্করণ। এই পুরাতন রূপকে ফিরিয়ে আনা সকলে সমর্থন করেননি। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ তারিখে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিকে একটি পত্র লেখেন, তিনি জানান '' বাংলা সাহিত্যের এই নাটকখানিকে বিকলাঙ্গ দেখতে ইচ্ছে করে না। '' সেই পত্রের কিছুটা অংশ উল্লেখ করা হল –

> '' আমার মতে শ্রীমান প্রশান্ত মহলানবিশ ১৩৩৩ সালে বিশ্বভারতী থেকে যে সংস্করণ বের করেছিলেন সেইটিই সর্বোত্তম, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলির সৌন্দর্য ও নাটকত্বের হানি হয়েছে।..... আর তাছাড়া হাসি ও তাতাকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু তারা সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাদ পড়েছে।..... পদে পদে অনেকগুলি Dramatic Ironyনষ্ট হয়ে গেছে। তাতে ক'রে বইখানির সৌন্দর্যহানি হয়েচে বলে মনে করি। '' ১০

**বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩) : প্রায়শ্চিত্ত ( ১৯০৯)**

'বউ ঠাকুরানীর হাট' গ্রন্থ হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ২৮ পৌষ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ বা ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩ সালে। এর আগে ভারতী পত্রিকায় কার্তিক ১২৮৮ থেকে আশ্বিন ১২৮৯ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। এই উপন্যাসের কাহিনি উৎস হিসাবে কবি একবার মন্তব্য করেছিলেন—

> ''সন্ধ্যাসঙ্গীতে গোধূলির মতো একটা অস্পষ্টতা আধ ছায়া অর্ধ প্রস্ফুট ভাষা বীজের অঙ্কুরের মতো।
> বউ ঠাকুরানীর হাটেরও বোধ হয় কতকটা সেইরকম। বোধ হয় ব্রজসুন্দর মিত্রের 'বাকলা চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' নামে একটা চটি বৈ হইতে একটু বীজ নেওয়া। নামটাই আমাকে মুগ্ধ করিয়া তাগিদ করিল।'' [১১]

আবার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ডে লিখেছেন -

> ''....বীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থ হইতে তাঁহার প্রেরণা পান সেটি হইতেছে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কৃত 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'(১৮৬৯)।
> ... বঙ্গাধিপের কতকগুলি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে নূতন রূপ লইয়াছে।'' [১২]

এই উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রকাশিত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে, নাম ছিল ঐতিহাসিক নাটক। নাটকটির বিজ্ঞাপন অংশে কবি লিখেছেন এটি উপন্যাস থেকে নেওয়া হলেও গ্রহণ ও বর্জনে নতুন হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপনটি ছিল

'বউ ঠাকুরানির হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নতুন গ্রন্থের মতো হইয়াছে। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩১ বৈশাখ সন ১৩১৬ সাল

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে কবি আবার এই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বহু দিক পরিবর্তন করে ভিন্ন এক নাট্যরূপ প্রকাশ করেন তার নাম ছিল 'পরিত্রাণ'।

প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮) : চিরকুমার সভা (১৯২৬)

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৯ চৈত্র 'চিরকুমার সভা' প্রকাশিত হয়, প্রকাশ করেন করুণাসিন্ধু বিশ্বাস। কিন্তু ভিন্ন রূপে হলেও একই নামে এই রচনা প্রথমে ভারতী পত্রিকায় ১৩০৭ বৈশাখ থেকে ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। এটি প্রকাশের সময় কবি লেখাটির বিষয়ে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একাধিক পত্র লিখেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রকাশিত চিঠিপত্র ৮-এ সেই পত্রগুলি সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি পত্রের উল্লেখ করা হল। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২৪ শ্রাবণ কবি লিখছেন

''প্রভাতকুমারের কাছ থেকে আশ্বিনের চিরকুমার সভার তাগিদ এসেছে - ভাদ্রেরটা পাঠিয়ে দিয়েছি।'' ১৩ ১৯০১ সালের মার্চ মাসের একটি পত্রে তিনি লিখছেন

> ''চিরকুমার সভার শেষ দিকটায় একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল - ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম—যেমন করে হোক শেষ করে দিয়ে অঋণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে তোমার কাছে শুনলুম শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসছে তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে।'' ১৪

প্রিয়নাথ সেনের পরামর্শ অনুসারে তিনি পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন এমনকি তার নিজের লেখার অন্বয় নিয়েও তিনি চিন্তিত। তাই ওই পত্রের শেষে কবি লিখছেন

> ''যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েচে কি না নিজে বুঝতে পারচি নে। একবার সমস্ত জিনিষটা একসঙ্গে ধরে দেখতে পারলে তবে ওর পরিমাণ সামঞ্জস্য বিচার করা যায় --- সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে। ...'' [১৫]

পত্রিকার এই পাঠ 'চিরকুমার সভা' নামে ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে। এরপর এই লেখা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ১৪ ফাল্গুন ( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ )। আগে প্রকাশিত চিরকুমার সভার কিছু কিছু সংলাপ বাদ দিয়া আবার কিছু সংলাপ যুক্ত করে কবি তৈরি করেছিলেন 'প্রজাপতি নির্বন্ধ'। তবে ভারতী পত্রিকা ও গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল ১৫ টি, বইএর ক্ষেত্রে সেটি হয়েছে ১৬।

স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য পরিবর্তিত এই 'প্রজাপতি নির্বন্ধ'র সংলাপের অংশকে প্রধান করে এর নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩২।

মালঞ্চ ( ১৯৩৪) :মালঞ্চ ( ১৯৬৮)

'মালঞ্চ' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২০ চৈত্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দে ( ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল)। এর আগে এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, ১৩৪০ এর আশ্বিন কার্তিক অঘ্রহায়ন সংখ্যায়। কবির এই উপন্যাস রচনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমরা পাই সুধীরচন্দ্র করের 'কবিকথা' গ্রন্থে –

> ''খড়দার গঙ্গার উপর এক বড় দোতালা বাড়ি, কবি সেখানে পুজোর সময় কাটাচ্ছিলেন। বৌমা প্রতিমা দেবী ও নাতনী পুপে কবির সঙ্গে ছিলেন; লেখককে কবির সঙ্গে সেবার কাটাতে হয়েছিল। এই সময়টাতেই মালঞ্চ বইখানির অধিকাংশ লিখিত ও সংশোধিত হয়। '' [১৬]

আবার ১৯৩৩ সালের ১৪ মার্চ কবির নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি পত্রে জানা যায় এই রচনা সম্পুর্ন করতে আরও কিছু সময় লেগেছিল

> "কোথায় মিলাল বাগান, মগজ থেকে ছুটে দৌড় দিল অর্কিডের চর্চা.....সরলার চেহারা ঝাপসা হয়ে গেছে, আদিত্য মোটরে করে নিউমার্কেটে চলে গেছে, আর এপর্যন্ত ফিরল না। আমি গল্পজমাইকাদের নিয়ে। ....." [১৭]

কবির এই উপন্যাস লেখাশেষ হয় আরও কিছুদিন পরে। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মে মাসে তিনি মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখদের এই গ্রন্থ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায়

> "সেদিন বোধহয় ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকাল। দার্জিলিংএ গ্লেনইডেন নামে একটি বাড়িতে গুরুদেব অবকাশ যাপনে এসেছেন। মালঞ্চ গল্পটি তখন সদ্য রচনা শেষ হয়েছে। একদিন তাই দার্জিলিংএ উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ এল গল্প শোনাবার। কবি পড়ে শোনালেন মালঞ্চ। বাঁশরি ও মালঞ্চএ দুটি গল্পই সেবার দার্জিলিংএ লেখা হয়।'' [১৮]

এই উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন কবি, সেটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ছিল। কিন্তু এই নাট্যরূপটি প্রকাশের ইচ্ছে কবির ছিল, ১ ভাদ্র ১৩৪০ তারিখে নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা একটি চিঠি থেকে আমাদের তেমনটাই মনে হয়। লিখছেন–

> "...তারপর মালঞ্চের নাট্যকরণে কোমর বাঁধতে হল। কারণ কোমরের প্রতিবেশী জঠরের তাগিদ ছিল। অথচ অভিনয় হতে পারবে বলে আশা নেই '' [১৯]

কিন্তু এই নাটক অভিনয়ের একটা সম্ভাবনার কথা সুধীরচন্দ্র কর তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন–

> ''মালঞ্চ উপন্যাসখানি নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে শান্তিনিকেতনে একবার অভিনয় করবার কথা হয়। এমনিতেই সমস্তটা বই কথা বার্তায় ভরানো। অধ্যায়গুলোকে দৃশ্য করে বর্ননার অংশগুলোকে প্রযোজনার নির্দেশের মধ্যে ভরে দেওয়া গেল। কথাবার্তার অংশ প্রায় যথাযথই রইল; এমনি করে তিন-চারখানা এক্সারসাইজ বুক-এ মালঞ্চ'র নাট্যরূপ দাঁড়করানো হল। কিন্তু সেটি শেষপর্যন্ত আর অভিনীত হয়নি।'' [২০]

যাইহোক কবির মৃত্যুর পর ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবির মৃত্যুর পরে, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে, প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পক্ষে রণজিৎ রায়।

যোগাযোগ ( আষাঢ় ১৩৩৬ ) : যোগাযোগ ( ১৪০২ )

'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থপ্রকাশের আগে বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যা থেকে চৈত্র ১৩৩৫ পর্যন্ত এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৪ এর ভাদ্র সংখ্যায় জানানো হয়েছিল 'আশ্বিন মাস হইতে রবীন্দ্রনাথের নতুন উপন্যাস আরম্ভ হইবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম দুই সংখ্যায় এর নাম ছিল 'দুইপুরুষ'। পরে তিনি এর নাম বদল করেন, কেন এই নাম পরিবর্তন তার কারণ হিসাবে সজনীকান্ত দাস জানিয়েছেন জলধর সেনের এই একই নামে উপন্যাস আছে বলে তিনি এই নামের পরিবর্তন ঘটান। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত যোগাযোগ উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র বীক্ষা পত্রিকায় পৌষ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে। পরে আলাদা বই আকারে শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিকের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় ১৪০২ এর পৌষ মাসে। রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শিশির কুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একটি চিঠিতে (তারিখহীন) তিনি লিখেছিলেন-

> "শিশির ভাদুড়ী যোগাযোগের নাট্যকরণ সম্বন্ধে ধন্না দিয়ে পড়ে ছিলেন। খানিকটা অংশ পূর্বেই করে দিয়েছিলুম। বাকি অনেকখানিই তিন চারদিনের মধ্যে লিখে দেবার জন্যে তার আবেদন। দুঃসাধ্য কাজ করতে হয়েছে,এমন একটানা পরিশ্রম আর কখনো করিনি। আমার নিজের বিশ্বাস জিনিসটি ভালোই হয়েছে। .....

উপযুক্ত অভিনেতা সংগ্রহ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ --- বিশেষ দক্ষ লোকের দরকার, নইলে শোচনীয় হবে।'' [২১]

২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৬ তারিখে এর অভিনয় হয়। এর পরের অভিনয় দেখে কবি মোটের উপর সন্তোষ প্রকাশ করে শিশিরকুমারকে লেখেন –

"…. মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমনসুসম্পূর্ণপ্রায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না --- তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতার মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে সেজন্য নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্তশিশির ভাদুড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না। '' [২২]

৩

১৮৯০ সালে অভিনয়ের তাগিদ থেকে 'বিসর্জন' নাটক লেখা হয়। তাই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি লেখার কিছু পরেই এর অভিনয় হয়। কিন্তু প্রথম অভিনয় কবে হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। প্রথম অভিনয়ের তারিখ নিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবিচ্ছবি' গ্রন্থের লেখক প্রভাত গুপ্তে প্রমুখের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। প্রভাতকুমার মনে করেন প্রথম অভিনয় হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। আবার প্রভাত গুপ্ত প্রথম অভিনয়ের তারিখ দিয়েছেন ১৮৯০ সালে জোড়াসাঁকো। এমনকি সেইসময়ের কোন পত্রপত্রিকায় অভিনয়ের কোন সংবাদ না থাকার জন্য প্রথম অভিনয়ের দিন নির্ধারন করা যায় না।

তবে সঠিক দিন না জানা গেলেও অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে প্রথম দিকের অভিনয় সম্পর্কে জানা যায়; 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তিনি লিখছেন –

"এই বাড়িতেই [ পার্ক স্ট্রিট] ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে বিসর্জন নাটক দেখানো হয়, পুরনো সিন তৈরি ছিল সেই সব খাটিয়েই। আমাদেরও পার্ট মুখস্থ ছিল। রবিকাকা পার্ট নিয়েছিলেন রঘুপতির, অরুদা জয়সিংহের, দাদা রাজার, অপর্ণা এই বাড়িরই কোন মেয়ে মনে নেই ঠিক। '' [২৩]

'পার্ট মুখস্থ ছিল' আর 'পুরানো সিন তৈরি ছিল' এই মন্তব্য থেকে মনে হয় এটি দ্বিতীয় অভিনয়ের কথা বলছেন তিনি। ১৩০৯ এর প্রবাসীর মাঘ ফাল্গুন সংখ্যায় অমৃতলাল গুপ্তের 'সেকাল ও একালের যাত্রা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে বিসর্জন নাটকের অভিনয়ের কথা বলেছেন –

"সেদিন রবীন্দ্রবাবু রঘুপতি সাজিয়া এমন চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন যে সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" [২৪]

এটিও দ্বিতীয় অভিনয়ের বর্ননা। কেননা সংগীত সমাজের অভিনয়ে এর সদস্য ছাড়া বাইরের কোন সভ্যের অভিনয়ের অধিকার ছিল না। কিন্তু উপরোক্ত লেখা থেকে জানা যায় এর অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রবাবুর ' পরিবারস্থ যুবকেরা'। সংগীত সমাজের প্রযোজনা হলে পরিবারের যুবকদের অভিনয় করার সুযোগ থাকে না। তাই আমাদের মনে হয় ১৯০০ সালের এই অভিনয় সংগীত সমাজের নয়। যদিও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই অভিনয়কে সংগীত সমাজের বলে মেনে নিয়েছেন। সে যাইহোক অমৃতলাল গুপ্তের এই লেখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এটি ছাড়া 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম দিকের অভিনয়ের কোন আলোচনা এখন অবধি সামনে আসেনি। সর্বপ্রথম এই নাটকের অভিনয়ের যে তারিখ জানা যায় সেটি হল ১৬/১২/১৯০০। এপ্রসঙ্গে ১২ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখের চিঠিতে কবি লিখছেন জগদীশচন্দ্র বসুকে বিস্তারিত লিখছেন । এই অভিনয়ের বিস্তারিত বর্ননা পাই কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী লেখায়। তিনি লিখেছেন—

"সে আমার জীবনে অপূর্ব উন্মাদনী অভিজ্ঞতা। কবিবরের রঘুপতি অভিনয় দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেলাম। সেই প্রিয় দর্শন সুকুমার তনু রবীন্দ্রনাথ রুক্ষ কঠিন রঘুপতিরূপে রূপান্তরিত। রক্তবর্ন পট্টবস্ত্রে দেহ বিমন্ডিত কুঞ্চিত কেশদাম ললাটোর্ধ্বে চূড়াকারে সংবদ্ধ কপালে ত্রিপুন্ডক ও রক্তচন্দনের ফোঁটা। ..... সে এক অপূর্ব অলৌকিক মূর্ত্তি।" [২৫]

আমরা খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে একই রকম প্রতিক্রিয়া পাই। এখানে কবির অভিনয়ে বৈশিষ্ট্যের কথা কিছুটা বলা দরকার। যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করতেন পুরোপুরি তার সাথে একাত্ম হয়ে যেতেন তিনি। তাঁর এই অভিনয় তন্ময়তার পরিচয় আছে দুটি লেখায়। অবন ঠাকুরের 'ঘরোয়া'তে। নাটক শেষে কবি উত্তেজনায় দূর দূর বলে কালীমূর্তিকে দুহাতে তুলে নিয়েছিলেন। আর একটির খোঁজ পাই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লেখায়। মাসিক বসুমতীর ১৩৬০ এর শ্রাবণ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন –

> "..... এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, খাঁড়া ব্যবহার কালে তাহা যে সত্যসত্যই তীক্ষ্ণধার তাহা ভুলিয়া গিয়েছিলেন। অভিনেতাদিগের মধ্যে আর একজন তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ধ্রুবকে তাড়াতাড়ি সরাইয়া না লইলে হয়ত একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিত।" [২৬]

এর পরের অভিনয় হয় ২৭ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখে। এই নাটক পরিচালনার কাজে কবিকে কীরকম ব্যস্ত থাকতে হত তার আভাস পাওয়া যায় একটি পত্রে। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে তিনি লিখেছিলেন কিভাবে তিনি উচ্চারণ শেখাতেন, অঙ্গভঙ্গির পাঠ দিতেন। কোনকোন দিন এই মহড়া শেষ হতে অনেক রাত্রি হয়ে যেত। এই নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে কবি মঞ্চসজ্জায় বিদেশী অনুকরণ রীতি বাদ দিতে পারেননি। যদিও এই সময় থেকে কবির মনে পৃথক এক মঞ্চভাবনা দানা বাঁধছে। আর কিছু দিন পরেই তার বর্হিপ্রকাশ ঘটবে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন নবপর্যায় পত্রিকায় প্রকাশিত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে। এই বিসর্জন প্রযোজনাকালে সেইভাবনার স্ফুরণ দেখা যায়। অতিবাস্তবতাকে বর্জন করার যে রূপ প্রকাশ পাবে ১৯০৮ লেখা শারোদৎসব নাটকে এখানেও তার সূচনা। অমিতা ঠাকুর লিখছেন "বিসর্জন নাটকের রিহার্সালে জয়সিংহরূপী অরুণেন্দ্রনাথবুকে ছুরি দিয়ে মাটিতে পড়ে পা দুটো একটু একটু নাড়াচ্ছিলেন খিঁচুনির মতো। দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ওকি হচ্ছে অমন করে পা নাড়াচ্ছ কেন? উত্তরে অরুণেন্দ্রনাথ বলেন বুকে ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করলে একটা খিঁচুনির মতো হবে না। শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না না ওসব চলবে না। অত বাস্তব অভিনয়ে কাজ নেই।" [২৭]

এই ১৯০০-১৯০১ পর্যন্ত তিনটি অভিনয়ের পরে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় আর কোন অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায়নি। এরপর সুদীর্ঘ ২২ বছর পরে ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে এর অভিনয় হয় কলকাতার এম্পায়ার মঞ্চে। প্রথমে অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল দি স্টেটসম্যান পত্রিকায়,২০ জুলাই ১৯২৩ তারিখে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির শারীরিক অসুস্থতার জন্য অভিনয় পিছিয়ে দেওয়া হয়। অভিনয় বাতিলের খবর ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ, অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অভিনয় হল আগস্ট মাসের শেষ দিকে। অভিনয়ের পাত্রপাত্রী ছিলেন -----

> "রঘুপতি --- দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর; জয়সিংহ --- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; গোবিন্দমাণিক্য --- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর; নক্ষত্রমাণিক্য --- তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়; অপর্ণা --- প্রথম রাত্রে মঞ্জু, পরে রানু অধিকারী; গুণবতী --- প্রথম রাতে সংজ্ঞা দেবী, পরে মঞ্জু ঠাকুর। " [২৮]

এই অভিনয়ের প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ছিলেন পরিমল গোস্বামী, সীতা দেবী, সাহানা দেবী প্রমুখরা। ' পুণ্যস্মৃতি ' গ্রন্থে সীতা দেবী লিখেছেন –

> " রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহ সাজিয়া নামিলেন, যদিও বয়স তখন ৬২ বৎসর। যে কেহ তাহাকে দেখিয়া যুবক বলিয়া ভ্রম করিতে পারিত, এমন সতেজ চলাফেরা দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। ..... গ্রামবাসীদের নৃত্যগীতগুলি অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল।" [২৯]

পরিমল গোস্বামীও কবির অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। ৬২ বছর বয়সে যুবকের অভিনয়ে কেমন নৈপুণ্য তিনি দেখালেন সেটা এবার আমরা দেখব সেসময়ের পেশাদার মঞ্চের বিশিষ্ট অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর লেখা থেকে –

> "সেদিন সে অভিনয় মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিকতর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব আর কেউ ছিল না। তাঁর প্রশস্ত ললাট, সমুজ্জ্বল চোখ উন্নত নাসা এবং সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি, তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সমস্তই ছিল অভিনেতার উপযোগী।"[৩০]

পরিমল গোস্বামী লিখেছেন-

> "এমন শ্রদ্ধাও তৃপ্তি নিয়ে আমি অভিনয় কমই দেখেছি। যা পাব আশা করেছিলাম,তার চেয়ে অনেক বেশি পেলাম। সবটা অভিনয় আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহ এবং দিনেন্দ্রনাথের রঘুপতি।" [৩১]

অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন-

> "সেদিনের সে অভিনয়মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিকতর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব আর ছিল না।" [৩২]

এই অভিনয়ের দর্শক হিসাবে ছিলেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত নট নাট্যকার অমৃতলাল বসু। এগুলো তো গেল কবির অভিনয়ের কথা। কিন্তু প্রযোজক, নির্দেশক রবীন্দ্রনাথ কেমন ছিলেন? কেমন করে তিনি বারবার অপর্ণা শিখিয়েছিলেন তার কথা আছে সাহানা দেবীর লেখায়। তিনি লিখছেন

> " প্রথম দৃশ্যে অপর্ণার ছুটে গিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের পায়ের কাছে ভেঙে পড়া ও দুঃখ বেদনা ক্ষোভ জড়িত কাতরকণ্ঠে বলা 'বিচার প্রার্থনা করি' – এই বিচার প্রার্থনা করি এইটুকু ঠিকমত ঠিকভাবে ঠিকভঙ্গিতে কিভাবে কেমন করে বলতে হবে তা বারবার নিজে করে দেখিয়ে দেবার যে শিক্ষা দেওয়া রবীন্দ্রনাথের দেখেছি, তা

> দেখে তখনই শুধু বিস্ময় বোধ করিনি, তা স্মরণ করে আজও বিস্ময় বোধ করি। ..... অপর্ণাকে কবির আপন হাতে তিলতিল করে গড়ে তোলার পর যেদিন রঙ্গমঞ্চে অপর্ণার প্রথম অভিনয় দেখি, সেদিন তার অভিনয় আর উক্তির মাঝে দেখতে পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আর এক দিক।''[৩৩]

একটি চরিত্রের অনেকগুলি স্তর থাকে, একজন দক্ষ অভিনেতা তার স্কিলের দ্বারা সেই স্তরগুলিকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। 'ঠিকমত ঠিকভাবে ঠিকভঙ্গিতে' এই বর্ননায় আমরা বুঝতে পারি মঞ্চ নির্দেশক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমনভাবে নিজেকে ঢেলে দিতেন চরিত্রকে আপন করে তোলার জন্য। একইরকমের ডেডিকেশনের কথা আছে শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়। আমরা জানি একটা নাটকের সার্থক অভিনয় মানে কেবল কিছু চরিত্র সংলাপ গান নিয়ে 'এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলা' নয়। টোট্যাল থিয়েটারে চরিত্র সংলাপ মঞ্চসজ্জা আলো সবকিছু মিলেই নাটক হয়ে ওঠে নাট্য, হয়ে ওঠে মঞ্চের কবিতা। এবার আমরা দেখব কেমন ছিল কবির মঞ্চভাবনা? The staging of Rabindranath's Visarjan এই শিরোনামে বিশ্বভারতী কোয়াটার্লিতে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে। এতে বলা হয়েছে-

> "…the stage was draped throughout in different shades of dark blue, deepening as they receded into the black ground. There was no changing of scene; the blood stained temple steps, designed in Cubist fashion, dominated the stage throughout, a lurid red light marked the entrance to the Temple itself..." [৩৪]

আরও নিখুঁতভাবে সেদিনের মঞ্চপরিকল্পনার কথা বলেছেন রাণু মুখোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন সবকিছুর স্কেচ করে অবনীন্দ্রনাথ , গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে নিতেন । ১৯২৩ সালের এই অভিনয়ের আগে কমকরে ছয় ডজন এজাতীয় খসড়া প্রস্তত করা হয়েছিল।

প্রায়শ্চিত্ত

১৩১৭ এর ২৫ বৈশাখ শান্তিনিকেতনের শিক্ষকেরা এই অভিনয় করেছিলেন। সেইসময়ের ছাত্র গিরিজানাথ চক্রবর্তীর স্মৃতি কথায় এর বর্ননা পাওয়া যায়। প্রথম অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন --

> "অজিতকুমার চক্রবর্তী—ধনঞ্জয় বৈরাগী; জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় - প্রতাপাদিত্য; সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার - বসন্ত রায়; জগদানন্দ রায়—রামচন্দ্র ; নগেন্দ্রনাথ আইচ - উদয়াদিত্য। মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে কথা উঠিল তাঁহারা অভিনয় করিবেন প্রায়শ্চিত্ত। গুরুদেব সকলকে সাজাইয়া দিলেন। জগদানন্দবাবুকে সাজাইয়া গুরুদেব বলিলেন মানিয়েছে যেন কার্তিকের মতো। জগদানন্দবাবু অভিনয় করিতেন খুব সুন্দর। হাস্যরসের পাঠ তিনি খুব ভালো করিতেন। সকলকে সাজাইয়া দিয়া গুরুদেব নিজে গিয়া দর্শকের সঙ্গে আসনে উপবেশন করিলেন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান খুব সুন্দর হইয়াছিল।'' [৩৫]

এরপর শ্রাবণ মাসে এই নাটকের আর একবার অভিনয় হয়। অভিনয় করেছিলেন আশ্রমের ছাত্ররা। ২ রা শ্রাবণ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন-

> "ছেলেরা প্রায়শ্চিত্ত অভিনয় করবে—তাদের জন্য মুখ রং করার তিনটে stick ও ভুরু আঁকার পেন্সিল আনিয়ে নিস'' [৩৬]

এই অভিনয়ের তেমন কোন বিবরণ পাওয়া যায়না। তবে অজিতকুমারকে ১৭ আশ্বিন লেখা এক পত্রে কবি বলেছেন-

> "তুমি চলে যাওয়ার পর আর একবার প্রায়শ্চিত্ত অভিনয় হয়েছিল কিন্তু বৈরাগীর পালাটা দেখে সকলেই বিশেষ অনুভব করেছিল যে তুমি চলে গেছ।'' [৩৭]

এর কয়েকমাস পরে একটি অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেটি ছিল এই নাটকের তৃতীয় অভিনয়। ১৮ আশ্বিন ১৩১৭ বঙ্গাব্দে এই অভিনয়ের আগে কবির মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিমা দেবী কে লেখা পত্রে

> " আমাদের অভিনয়ের দিন আসছে অথচ আজ পর্যন্ত আমার ভালো মুখস্থ হয়নি বলে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। মুখস্থ হবে কি করে? দিন রাত নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতেই দিন কেটে যায়। কলকাতা থেকে এখানে এসে পর্যন্ত আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে"। [৩৮]

অভিনয়ের বিবরণ আমরা না পেলেও কবি নিজের অভিনয় নিয়ে যে কতখানি চিন্তিত ছিলেন তার পরিচয় একাধিক চিঠিতে পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন-

> "....কাল বড়োর দল প্রায়শ্চিত্ত করবে। ... এবারে সকলে আমাকে বৈরাগী সাজবার জন্য নিতান্তই চেপে ধরেছে - রাজি হয়েছি - তুলনায় পাছে হটে যাই এ ভয় যে একেবারে মনে নেই তা বলতে পারিনে—কিন্তু এখন ত আমার হারবারই বয়স হয়েছে - গাণ্ডীব তুলতে আর পারব না --- অহংকারকে পদে পদে বিসর্জন দিতে হবে ''৩৯

চিরকুমারসভা

মজার ব্যাপার হল এই নাটকটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কখনই প্রযোজিত হয়নি। তবে বহুবার রবীন্দ্রনাথ এটি পাঠ করে শুনিয়েছেন। এমনই এক নাট্য পাঠের বিস্তারিত বর্ণনা পাই হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনায় :

> "অভিনয়ের উপযোগী করে প্রস্তুত পাণ্ডুলিপির পাঠ শোনবার জন্যে আমন্ত্রণ এল নাট্যকারের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখে তাঁর একাধিক নাটকের পাঠ এর আগেই আমরা শ্রবণ করেছিলুম। কিন্তু এবারকার অনুষ্ঠান অধিকতর স্মরণীয় হবার কারণ, এই পাঠ হয়েছিল একাধারে আবৃত্তি ও অভিনয়ের মাঝামাঝি । জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর 'বিচিত্রা ক্লাব বা সভা ছিল অতিশয় বিখ্যাত বৈঠক।" [৪০]

কবি রবীন্দ্রনাথ 'প্রজাপতির নিবন্ধ'কে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শিশিরকুমারের জন্যে, যদিও শেষ পর্যন্ত তা অভিনীত হল স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা।

এই আর্ট সম্প্রদায় নাটকটি প্রথম অভিনয় করেন ১৮ জুলাই ১৯২৫। কিন্তু কবি এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন না। পরে ২৫ শে জুলাই শনিবার (৯ শ্রাবণ) দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে স্বয়ং বিশ্বকবি স্টার থিয়েটারে উপস্থিত থেকে এর অভিনয় দেখেছিলেন। এখানে 'চিরকুমার সভা'র প্রথম পরিচালক হিসাবে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিমতও প্রণিধানযোগ্য :

> "আমাদের পার্ট সব আমরা পেয়ে গেছি, বই অবশ্য নাট্যাকারে তখনো ছাপা হয়ে বেরোয়নি। ঠিক হয়েছিল, কবি যে-সব নতুন গান এতে সংযোজিত করছেন, সেগুলির স্বরলিপি রাধাচরণ গিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে আসবে। রাধাচরণ তুলে নিয়ে আসবে, আর গানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখে দেবেন মঞ্চ ব্যবস্থা—সেটিসন প্রভৃতি। তখনকার থিয়েটারের গানের লেখকেরা একটা জিনিস ভালো জানত, সেটা হচ্ছে, যাকে বলে, শর্টহ্যান্ড নোটেশন। রাধাচরণও জানত। সুতরাং গান একবার গাইতেই রাধাচরণ সেটা শর্টহ্যান্ড নোটেশনে টুকে নিচ্ছে আর তারপরেই কবিকে বাজিয়ে শোনাচ্ছে। কবিও ব্যাপার দেখে অবাক। শুনেছিলুম, এ ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কবি।" [৪১]

সেইসময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত এই ভাবে :

> "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা। স্বয়ং কবি ও শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সুর-লয়ে গঠিত, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিকল্পিত দৃশ্যপটে মহাসমারোহে অভিনয়।" [৪২]

'চিরকুমার সভা'র কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন:

রসিক-অপরেশবাবু, অক্ষয়—তিনকড়িবাবু, চন্দ্রবাবু—অহীন্দ্রচৌধুরী, পূর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন রাধিকানন্দ, শ্রীশ—ইন্দুবাবু, গুরুদাসকাশীনাথবাবু, শৈল—সুশীলাসুন্দরী, সুরবালা-রানীসুন্দরী, নীরবালা-নীহারবালা, নৃপূবালা—ফিরোজাবালা, নির্মলা নিভাননী, জগত্তারিণী—নন্দরাণী। ৪৩

স্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ১৯২৫-এ 'চিরকুমার সভা'র প্রথম অভিনয়ের পর, মিনার্ভা থিয়েটারে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২, ৮ এপ্রিল ১৯৩৭ স্টার মঞ্চে নবনাট্য মন্দির, ১৪ জুলাই ১৯৪০ নাট্যনিকেতন, ১৩ এপ্রিল ১৯৪০ নাট্যভারতী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হয়েছে ।

যোগাযোগ:

১৯৩৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর নবনাট্যমন্দিরে প্রথম এই নাটকের অভিনয় হয়েছিল, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনা ও পরিচালনায়। এর আগে অবশ্য এই নাটকের অভিনয় হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সালে, প্রেসিডেন্সি কলেজের শারদ সম্মেলন উপলক্ষ্যে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে, হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের পরিচালনায়, তিনিই এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন । হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের পুত্র কমলকুমার ভঞ্জ জানিয়েছিলেন সেইদিনের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। নাটকটি দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং অভিনয় করবেন বলে স্থির করেন। সেইমতো হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের কাছ থেকে অভিনয় কপি চেয়ে নেন। মঞ্চায়নের আগে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই কপিটি কবিকে দেখিয়েছিলেন। কারণ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ তারিখে কবি হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জকে লিখছেন-

> " ...সতীধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি নাটকটাকে যে পথে নিয়ে গেছ বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শে সেটা হৃদ্য নয়। শিশিরকুমারকে বলেছিলুম যথোচিত শোধন করে ওটাকে গ্রহণ করতে - তিনি কী করেছেন জানি নে।" [৪৪]

যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি 'যথোচিত শোধন'র ব্যাপারে অন্যের উপর আস্থা রাখতে না পেরে নিজেই এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলনাবীশকে তিনি লিখেছিলেন শিশির ভাদুড়ী ধন্না দিয়ে পড়েছিলেন। তারই অনুরোধে কবি এর নাট্যরূপ দেন। যাইহোক এই নাটকের প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল ২০ ডিসেম্বর, আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই নাটকের অভিনয়ের আগের সংবাদ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অভিনয় হবার পরে দেশ পত্রিকা লিখল-

> "যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ট উপন্যাস। তিনি ইহা নাট্যরূপ দিয়াছেন শিশিরকুমার প্রযোজনা করিয়াছেন। শিশিরকুমার কঙ্কা, শৈলেন চৌধুরি রাণীবালা প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ইহাদের অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছে। এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও নাটকখানি কোথাও ভালো করিয়া জমে নাই। তাহার কারণ নাট্যরূপের দোষ। ...যেখানে সেখানে যা তা গান গান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে নাটকীয় আবহাওয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"[৪৫]

এখানে দেশের প্রতিবেদক অভিনয়ের সুনাম করলেও নাট্যীকরণ তাদের পছন্দ হয়নি বলে জানিয়েছেন।
এই নাট্যরূপ নিয়ে ২৫ জানুয়ারি 'কেশরী' পত্রিকার মন্তব্য মারাত্মক। প্রতিবেদক লিখছেন-

> " কিন্তু এ নাটকখানি দেখে কখনও কারো মনে হতে পারে না যে এ রবীন্দ্রনাথের রচনা। এবিষয়ে আমাদের আগ্রহ হওয়ায় আমরা শিশির সম্প্রদায়েকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু তারা বলেন এ কবীন্দ্রের নিজের রচনা। .....দেখে কেবল একটি কথাই আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল হায় রবীন্দ্রনাথ হায় শিশিরকুমার। যোগাযোগ বেশিদিন চলবে বলে আমরা মনে করিনা।" [৪৬]

এই নাট্যরূপ নিয়ে প্রায়ই একইরকম কথা বলেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। সাপ্তাহিক 'ছন্দা' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন তাঁর মনে হয় কবি স্বেচ্ছায় এর নাট্যরূপ দিতে চাননি। মঞ্চে চরিত্রের পরোক্ষ উপস্থিতি, গানের যথাযথ প্রয়োগের অভাব দেখে তাঁর মনে হয়েছে 'মঞ্চের এ নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে তৈরি হয়নি।' সবমিলিয়ে তিনি মনে করেন যোগাযোগ কে নাটক না বলে তিনি 'উপন্যাসের নাট্য চিত্র' বলা চলে। এইসব বিরূপ সমালোচনার পাশাপাশি 'দুন্দুভি' পত্রিকায় 'নব নাট্য মন্দিরে যোগাযোগ' এই শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে এর নাট্যরূপ ও অভিনয় বেশ উঁচুদরের হয়েছে। কিন্তু এর অভিনয় বেশিদিন চলবে না তার কারণ অবশ্য নাটকের প্রয়োগের দুর্বলতা নয় তিনি দায়ি করেছেন দর্শকের নাট্য রুচিকে। তিনি লিখেছেন বাংলার দর্শক চায় 'চার আনাকা --- খেল।' আর এই খেল দেখাতে না পারলে এদেশের ললিতকলার নিস্তার নেই। আর তাই শিশিরকুমারকে মঞ্চে ' হাসতে হবে গাইতে হবে চিৎকার করতে হবে, অলৌকিক দৃশ্যের অবতারনা করতে হবে, 'শয়তানের থাবা' 'বারনারীর অশ্রুপুরী', 'কবন্ধের প্রাচ্যনৃত্য' ঘন ঘন এই সব নামধারী নাটকের আমদানি করতে হবে তবে যদি তিনি বাঁচতে পারেন---- নইলে এই বাংলাদেশে শিশিরকুমারকে জীবিকার অন্য পন্থা নিতে হবে।'

১৮৯০ সালে মঞ্চে উপস্থাপনের জন্যই কবি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন 'রাজর্ষি' উপন্যাসের। তিনি যে সময়ে নাট্য চর্চা আরম্ভ করছেন সেটি পেশাদার থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। বাংলা মঞ্চের মধ্যগগনে তখন বিরাজ করছেন গিরিশ ঘোষ। সেজন্য প্রথম দিকের 'রাজা ও রানী', 'মালিনী', কিংবা 'গোড়ায় গলদ' সবকটা নাটকে শেক্সপিরীয় গঠন ও প্রত্যক্ষ নাট্য দ্বন্দ্বের উপস্থিতি দেখা যায়, যেটি সেই সময়ের অন্যতম লক্ষণ। তবে হ্যাঁ প্রযোজনা করতে গিয়ে তিনি এই এক্কেবারে বাস্তবের অনুকরণের কুফল অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিসর্জন অভিনয়কালে বাস্তবের অনুকরণ থেকে সরে আসতে না পারলেও এর কিছুদিন পরেই 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' র পাতায় প্রকাশ পাবে কবির 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি। সেখানে যে নাট্যভাবনার কথা বলবেন তিনি সেটিই ১৯০৮ সালের পর থেকে লেখা একের পর এক নাটকে প্রয়োগ করবেন।এই যে বিকল্প এক নাট্যভাবনা সেটি পেশাদার মঞ্চের সাথে খাপ খায় না তা তিনি ভালো করেই বুঝতেন। আর সেজন্যই অভিনয়ের জন্য বেছে নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন, কলকাতাকে নয়। বৃহত্তর দর্শক সমাজের সাথে তাঁর নাটকের সংযোগ স্থাপিত না হলেও তিনি তাঁর নাটকগুলি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন।।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ছেলেবেলা, সূত্র রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা, পৌষ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৭১৭।
২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭, পৃষ্ঠা ৭৩।
৩। ঘোষ সুব্রত, রবিনাটকের নাট্যকথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭০।
৪। দাসী বিনোদিনী, আমার অভিনেত্রী জীবন, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭।
৫। ঘোষ সুব্রত, রবি নাটকের নাট্যকথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৯।
৬। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী(প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আগস্ট ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৯৮।
৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭, পৃষ্ঠা ১৭৪।
৮। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, ঘরোয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ২১।
৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলি(১৬), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মে ২০০১, পৃষ্ঠা ৬২৫।
১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ১৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা ১৮১।
১১। সেন ক্ষিতিমোহন, দিনলিপি, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃষ্ঠা ১৩৮।
১২। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৭৭, পৃষ্ঠা ১৫৪।
১৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১১৪।
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৮৮।
১৫। ঐ , পৃষ্ঠা ১৭৬।
১৬। কর সুধীরচন্দ্র, কবি-কথা, সুপ্রকাশন, কলকাতা ১৯৫১, পৃষ্ঠা ২৯-৩০।
১৭। দেশ পত্রিকা, ৯ ভাদ্র, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ৩১৪।
১৮। দেবী মৈত্রেয়ী, মজুমদার, শ্রী অমিয়কুমার, কবি সার্বভৌম, ৯৩/১এ, বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা, ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ১৫।
১৯। দেশ, কলকাতা, ১৬ ভাদ্র, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ৪০২।
২০। কর সুধীরচন্দ্র, কবি-কথা, সুপ্রকাশন, কলকাতা, ১৯৫১, পৃষ্ঠা ৪০।
২১। দেশ, কলকাতা, ১০ আশ্বিন ১৩৮২, পৃষ্ঠা ৬৫৯।
২২। মিত্র অমল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৫৪।
২৩। ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ৮৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২
২৪। প্রবাসী পত্রিকা, এলাহাবাদ, মাঘ ফাল্গুন ১৩০৯, পৃষ্ঠা ৩৫৪।
২৫। রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৩।
২৬। ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, সঙ্গীত সমাজ, সূত্র মাসিক বসুমতী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃষ্ঠা ৫৭৬।
২৭। ঠাকুর, অমিতা, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ সংকলন, বৈশাখ ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ১৪।
২৮। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃষ্ঠা ১৬০।
২৯। দেবী সীতা, পূণ্যস্মৃতি, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৮৮।
৩০। চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৫৭।
৩১। ঐ, পৃষ্ঠা ৫৮
৩২। ঐ, পৃষ্ঠা ৫৭
৩৩। দেবী সাহানা, স্মৃতির খেয়া, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ১৬৩।
৩৪। The staging of Rabindranath's Visarjan , বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, অক্টোবর ১৯২৩, পৃষ্ঠা ১০২।
৩৫। চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দ নারায়ণ ও গঙ্গোপাধ্যায় হিমাংশুনাথ, সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সমিতি, ত্রিপুরা, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ২৪০।
৩৬। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪, পৃষ্ঠা ৩৭।

৩৭। পাল প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী ৬, পৃষ্ঠা ১৬৮, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৩৯৯।
৩৮। চিঠিপত্র ৩, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৪৯, পৃষ্ঠা ১০২।
৩৯। পাল প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী ৬, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃষ্ঠা ১৭৬।
৪০। চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, জুন ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১০১।
৪১। ঐ, পৃষ্ঠা ২০৩।
৪২। ঐ, পৃষ্ঠা ২০৪।
৪৩। ঐ, পৃষ্ঠা ২০৪।
৪৪। চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২০৬।
৪৫। ঐ, পৃষ্ঠা ২১০।
৪৬। ঐ, পৃষ্ঠা ২১৩ ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। ঘোষ শান্তিদেব, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯০।
২। ঘোষ সুব্রত, রবিনাটকের নাট্যকথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৭।
৩। চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া , আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫।
৪। চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯।
৫। চৌধুরী অহীন্দ্র , নিজেরে হারায়ে খুঁজি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা ১৯৬২।
৬। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, ঘরোয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২।
৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১৫।
৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা,মাঘ ১৪০৬।
৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা,মাঘ ১৪০৬।
১০। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (সুলভ সংস্করন), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা,মাঘ ১৪০৭।
১১। ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ, আমার বাল্যকাল ও বোম্বাই প্রবাস, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯১৫।
১২। পাল প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৫।
১৩। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবন কথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৬১।